আমার শিকার জীবন

(কবির উদ্দিন আহমদ খান)

১. শিকারের হাতেখড়ি ঃ আমার পিতামহ নাসির উদ্দীন আহমদ খাঁন ছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) থেকে চল্লিশতম অধস্তন পুরুষ। লর্ড এলেন বরোর আমলে (১৮৪২ থেকে ১৮৪৪) ডেপুটি কালেক্টর পদের প্রবর্তন হলে, চট্টগ্রামের আদি তিন জন মুসলমান ডেপুটি কালেক্টরের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৮৬৭ সালের ২৭শে জুলাই মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন। তিনি একজন দক্ষ শিকারি ছিলেন। তখন দেশে শিকারও ছিল প্রচুর। শিকার আমাদের বংশগত প্রেরণা। আব্বা বলতেন ঃ আমার আব্বা নাসির উদ্দিন খাঁন ডেপুটি যখন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শিকারে যেতেন তখন বনে-জঙ্গলে চার-পাঁচ দিন কাটাতেন। বড় বড় হরিণ শিকার করতেন। খেয়ে দেয়ে যা বাঁচত তা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। কোন বার শিকার পাওয়া না গেলে দুই মাইল দূরবর্তী খামার বাড়িতে উঠে তাঁর পছন্দ মত সবচেয়ে লায়েক ষাঁড়টিকে শিকার করে বাড়ি ফিরতেন। তার জীবনে অনেক বাঘ মেরেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি ছিল নরখাদক। আব্বা তৈয়ব উল্লা খাঁ ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। দক্ষতাও অন্যান্য অনেক গুণের জন্য সরকার তাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তার অনন্যসাধারণ লক্ষ্যভেদ সে কালে এক প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

আমি নিজে বন্দুক নাড়াচাড়া আরম্ভ করি ১৯০৯ সন থেকে। ১৯১৮ সনে পড়াশুনা শেষ করে বাড়ি ফিরেছিলাম। সে বছর আমাদের বাড়ি থেকে তিনমাইল দূরে পার্বত্য অঞ্চলে হাতির খেদা দিয়েছিলেন ধুম নিবাসী রায় বাহাদুর গোলক চন্দ্র রায়ের পুত্রগণ। আমি তাঁদের সঙ্গে থেকে খেদার ব্যাপারে আদ্যোপান্ত দেখার সুযোগ পেয়েছিলুম। এ উপলক্ষে প্রায় দুই মাস বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। এতে শিকারের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায়। কিছুদিন পরে হাটহাজারির ওমর মিঞা জমিদারের খেদায় আমি অংশীদার হয়ে পড়ি। এরা পুরুষানুক্রমে খেদা অনুষ্ঠানের কাজ করতেন। এ সময় পার্বত্য অঞ্চলের ভাণ্ডাল জুড়ি এলাকায় শিকার করে বেড়াই। আমার শিকার জীবনের এ পর্ব চলে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ১৯২৩ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত আমার জীবন কাটে ফেনী, রাজশাহী, রংপুর এবং তমলুকে।এ সময়ে শিকার করি নানাবিধ জলচর প্রাণী। বিশেষ করে 'চখা' এবং 'রাজহাঁস' শিকারের ঘটনা সব সময় মনে জাগ্রত হয়।

২। **প্রথম গয়াল শিকার ঃ** এইটা পার্বত্য অঞ্চলের বড় শিকারের পালা। ১৯২৩ সালে চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম, শিকারে বেরুলাম চকরিয়া থানার ফাস্যাখালি এলাকায়। সঙ্গে বারো জন বন্দুকধারী শিকারি আর চব্বিশ জন সাঙ্গপাঙ্গ। ১৪ দিন ঘুরে দেখা পেলাম এক জোড়া গয়ালের। একটির গায়ে গুলি লাগালাম। অতঃপর চললো পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরো কাছে যাওয়ার পালা। এর ভার থাকলো দুই বন্দুকধারীর উপর। কিন্তু তারা গয়ালের কোন উদ্দেশই করতে পারলো না। পরে জেনেছিলাম তারা দিশেহারা হয়ে যায়, যে গয়ালটি গুলি খেয়েছিল সেটিকে পিছন ফেলে অক্ষত গয়ালটির পিছু নিয়েছিল। কিন্তু গয়ালটি তাদের দৃষ্টির বাইরে পালিয়ে যায়। তাদের বিফলতায় বিরক্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সন্দেহ কিছুতেই ঘুচতে চাচ্ছিল না। সাত দিন বিশ্রাম করে আমরা আবার শিকারে বেরুলাম। এবার অধিকন্তু সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট শিকারি হাজি সৈয়দ আহমদ সাহেব। আগের জায়গায় ফিরে এলাম। শুনলাম আহত গয়ালটিকে বাঘে খেয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত পেলাম, গোটা পাঁচ বাঘ মিলে গয়ালটিকে সাবাড় করেছে। পড়ে আছে শুধু তার কঙ্কাল।

এবারও গয়ালের ঝাঁকের পদচিহ্ন পাওয়া গেল। সে চিহ্ন ধরে তিনদিন অনবরত অনুসরণ করলাম। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে একটি বাঘ আমাদের চোখে পড়লে আমার উদীয়মান সাগরেদ মোহাম্মদ হোসেন পেছন থেকে একটি গয়ালের উপর গুলি চালিয়ে দিলে গয়ালের ঝাঁক পালিয়ে গেল। আমরা এগিয়ে গিয়ে কোথাও রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম না, অগত্যা ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সকালে বের হয়ে আমরা দু'দলে বিভক্ত হলাম। আমাদের এক দল আহত গয়ালটি খোঁজ করতে করতে উঠলাম এক পাহাড়ের শীর্ষে। সেখানে প্রচুর জমাট রক্ত দেখতে পেলাম। নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়েই দেখা গেল গয়ালটি একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তিন গুলি করে তকে ধরাশায়ী করলাম এবং কানের ভিতর বন্দুক ধরে জবেহ কার্যসমাধা করলাম। সঙ্গীদের সাহায্যে এটাই আমার প্রথম গয়াল শিকার। ততক্ষণে আমাদের শিকারি দলে লোক জুটে গিয়েছিল ৪৮ জন। বারো জন পাহাড়ির সাহায্যে গয়ালটিকে পাহাড়ের গা থেকে নিচে নামিয়ে আনা গেল। বারো জনকে পুরস্কার দিতে হলো বারো থুরম (ঝুড়ি) মাংস। সকলে মিলে আমরা গোসতো দু'বেলা আহার করলাম। তারপরও বাকি থাকলো যেটা সেটা আমার বাড়ি পর্যন্ত বয়ে আনতে ১৮ জন লোকের গলদঘর্ম হয়ে গেল। গয়ালটির ওজন কোনক্রমেই ১৬ মণের কম হতো না।

গয়াল সম্বন্ধে আমার এই ধারণা যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই জন্তু মানুষকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু, বাইসন (গয়াল) ভীষণ ইহার মূর্তি, আহত হ'লে ছুটে চলে যমদূত গতি।

৮০ বছর আগে গয়াল শিকারে বের হয়ে আমার জেঠামনি মরহুম আজিজুল্লা খান (এই বই এর লেখকের পিতামহ) একবার বিপদে পড়েছিলেন। তাঁর আপাদমস্তক ছিল পোশাকে ঢাকা। পাহাড়ের চূড়ায় ছিলেন তিনি। নিচে শন খোলায় কতকগুলি গয়াল চরছে। অমনি গুলি করেন। গুলি লাগে একটা গয়ালের কাঁধে। গয়াল ঊর্ধ্বশ্বাসে তার দিকে ছুটে আসছিল। কোন বড় গাছ দেখে ওঠার সময় ছিল না। তিনি পাশের দুর্গম ঝোপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। গয়াল তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ঘ্রাণে অনুমান করে তিনি কোথায় লুকিয়েছেন। তখন তাঁর মুখের উপর দিকে নাক ঘসতে থাকে (অবশ্য লতাপাতার উপর দিয়ে)। এতে তার মুখের উপর ডান দিক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ক্ষতের দাগ নিয়ে তাঁকে কবরে যেতে হয়েছিল। এক বিখ্যাত আমেরিকান শিকারির উক্তি, যে কোন ভাষায় নাম হোক, গয়াল অত্যন্ত বদ প্রাণী।

(১৯৩৮ থেকে ৪০) এ কর্মজীবনে ফেনীর নিক পরিষাদি সংলগ্ন পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে গয়াল শিকার করি। আমার বড় ছেলেও সঙ্গে ছিল। প্রথম গুলিতেই সে গয়ালটিকে ধরাশায়ী করে। ধাক্কা সামলে নিয়ে গয়ালটি উঠে খুব দ্রুত গতিতে পালাতে থাকে। আমি ছেলেকে নিরাপদ স্থানে রেখে তার পিছু নিই। সঙ্গে তিনজন অনুচর। প্রায় চার ঘন্টা ধাওয়া করে এবং পর্যায়ক্রমে লুকোচুরি খেলে আরও তিন গুলি ওটাকে লাগান গেল। শেষ পর্যন্ত আমার গুলিতে গয়ালটি শেষ বারের মত ধরাশায়ী হলো। আমরা ওটাকে জবেহ করলাম। আমার কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের শিকারের লাইসেন্স ছিল। কিন্তু এই রাজ্যে গয়াল গরু শ্রেণীভুক্ত। আমি মনে করতাম গয়াল মহিষ শ্রেণীভুক্ত। রাজ্যে গো হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। আমার গয়াল শিকার নিয়ে এক সেসন কেস দায়ের হয়ে গেল। অপরাধ গো হত্যা। সঙ্গে কল্পিত নরহত্যাও। তবে সামান্য তদবিরেই এ বিপদ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে গেল। ত্রিপুরাধিপতির আদেশে অভিযোগকারী পক্ষ নিজ খরচে মোকদ্দমা উঠিয়ে নিলেন।

৩। প্রথম বাঘ শিকার ঃ সব শিকারিদের ন্যায় আমারও আগ্রহ ছিল বাঘ মারার। বাঘের তালাশে অনেক মাচানে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পূর্ণ বয়স্ক বাঘের সঙ্গে ১৯৪৩ সালের আগে মোলাকাত হয়নি। সে সালে শুরু হয়েছে একটা দুর্দান্ত চিতাবাঘের লীলাখেলা। খবর পেলাম পরপর পাঁচটি গরু মেরেছে। তাজা খবর হলো শেষ গরুটা মেরেছে আমার বাড়ির অনতিদূরে এক মাইলের মধ্যে। তাও আবার দিনের বেলায়। শিকার করা গরুটাকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে খাওয়ার উদ্দেশ্যে নিকটেই বাঘটি রাত্রির অন্ধকারের অপেক্ষা করছে। শেষ বেলা দু'জন অনুচরসহ ঘটনাস্থলে গিয়ে মাচা বাঁধলুম। ঝোপ থেকে গরুটিকে টেনে এনে চলাচলের পথের উপর রাখলাম। গরুটি খুব বড় আকারের। তদুপরি

ফুলে গিয়ে আরও বড় দেখাচ্ছে। অনুচরদের নিয়ে নিজের বন্দুক হাতে মাচানে বসে আছি। ভাদ্র মাস, মেঘলা দিন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এমন সময় অনুচরদের একজন বলল, আমি বাঘ দেখতে পাচ্ছি। বাঘ তখন গরুর আড়ালে। আমার ক্ষীণ দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে অত দূর পৌছায়নি। আমি ওর হাতে বন্দুক দিয়ে বললাম মার। কিন্তু মারবে কি? ইতিমধ্যেই সে কাঁপতে শুরু করেছে। আমি তার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিলাম। অপর অনুচরকে বললাম টর্চ মার। টর্চের আলো গিয়ে পড়লো বাঘের মাথার পিছনে। বাঘ তখনও গরুর আড়ালে শায়িত অবস্থায়। আলো পড়ার সঙ্গে সে মাথা ঘুরিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তার দুটি চোখই এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো। আমি তখনই চোখ নিশান করে ফায়ার করলাম। বাঘ ধরাশায়ী হয়ে গেল। তথাপি রীতিমত দ্বিতীয় গুলি করলাম। বাঘ একই অবস্থায় থেকে গেল। নেমে এসে দেখলাম প্রথম গুলি বাঘের মস্তিষ্কের তন্ত্রী ভেদ করে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ শোনবার আগেই প্রাণ ত্যাগ করেছে। তৃতীয় গুলি মারালাম সেই ভিতু অনুচরকে দিয়ে। বললুম জ্যান্ত বাঘের ভয় এখন নেই। বাঘ মারার খবর পেয়ে সরকারি রাস্তা থেকে বাঘ দেখতে বহু লোক এখানে জড়ো হয়ে গেল। তারা উৎসাহে বাঘ বয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌছিয়ে দিল। রাত তখন ৮টা। জনতার সামনেই মেপে দেখা গেল বাঘটি দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। চিতা বাঘ সচরাচর ৭ ফুটের বেশি হয় না। সুতরাং এটা একটি সর্ববৃহৎ চিতার দৃষ্টান্ত।

৪। **হরিণ শিকার ঃ** হরিণ শিকার অনেক করেছি। ১৯৪০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমায় অবস্থান কালে ছোট হরিণ অনেক শিকার করে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। ১৯৪৫ থেকে ৫৩ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জিলার মধুপুরের গড়ে হরিণ শিকার করেছি। শিকার জীবনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য স্থানেও অনেক ছোট হরিণ মেরেছি। জলপাইগুড়িতে মেরেছি অনেক পীতবর্ণ এবং মিশ্র দাগবিশিষ্ট হরিণ। চট্টগ্রামে আমার বাড়ির ৮/১০ মাইলের মধ্যেও অনেক বড় হরিণ মেরেছি। এই এলাকার বেশির ভাগ পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। বড় হরিণ যে কয়টি মেরেছি সব কটাই হয় দৌড়ের মধ্যে নয় লাফ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এই সময় গুলি মেরেছি।

১৯৫৫ সনে খবর পেলাম আমার বাড়ির ছয় মাইল দূরে একটি অতিকায় বড় হরিণ এসেছে। অনুচরদের পাঠিয়ে দিলুম খোঁজ নিতে। তারা এসে বল্লো, পায়ের দাগ মেপে মনে হচ্ছে এটা একটা তিন পোয়া গয়াল। অর্থাৎ এত বড় হরিণ প্রায় গয়ালের সমান হবে। পরের দিন শুভ দেখে শিকারে বেরুলাম সঙ্গে চার জন অভিজ্ঞ শিকারি। এক জায়গায় এসে মনে হলো হরিণটা বোধ হয় এখানেই আছে। এটা একটা জঙ্গল। জঙ্গলটার চারিদিকে একটা চক্কর দিয়ে এলাম। কতক

অনুচরদের জঙ্গলে ঢুকতে দিলুম। যে সব পথে হরিণ বের হতে পারে বলে মনে হলো প্রত্যেকটির মুখে এক একজন শিকারি বসিয়ে দিলুম। সব এলাকা মোটামুটি ঘিরে রয়েছে একটা পাহাড়ি স্রোত। আমি চক্কর দিয়ে সব তদারক করতে লাগলুম। একজন শিকারি পেয়ে গেছে বেশ এটা চওড়া জায়গা। তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন, এ জায়গাটি বেশ, আপনি এখানে থাকুন। আমি বল্লুম কোন সঙ্গীকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসা তো নেতার ধর্ম না? আপনি সাবধানে বসে থাকুন। আমি আরো তিনশত গজ গিয়ে একই রেখার একটা ঝোপের ভিতর আসন নিলুম। হঠাৎ যেন আমার চোখে ধাঁধাঁ লাগল। এটা ধাঁধাঁ না। অনুচরদের হাঁকেডাকে চকিত হয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে হরিণের পলায়ন। এ জ্ঞান যখন আমার হলো তখন হরিণ লাফ দিয়ে স্রোত ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হরিণ তখন আমার একশ গজ দূরে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলুম। হরিণ তখন বাতাসে ভর করছে, কিন্তু নিশান থেকে একগজ আন্দাজ দূরে, গুলি লেগেছে তার তলপেটে। তলপেট কেটে ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়লো, ছোটার তখনও বিরাম নেই। অল্প কিছুদূর অনুসরণ করেই হরিণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে চারিদিক থেকে এসে পড়েছিল। তারা হরিণটিকে জবেহ করলো। এটা সাধারণ বড় হরিণ নয়, এটা একটা অতিকায় "এন্টিলোপ'। এ এলাকায় এরূপ হরিণ আমি আর দেখতে পাইনি। এর পা বেশ মোটা। ওজন ছিল প্রায় নয় মণ।

৫। **পাখি শিকার ঃ** এটা একটা অন্য এক ধরনের আমোদ। এতে বিপদের আশংকা কম। তবে, আমোদ হালকা হলেও থ্রিল কিছু মাত্র কম নয়। রাজহাঁস ও চখা প্রচুর শিকার করেছি পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে, মানিকগঞ্জে ১৯৩৬-৩৭ সালে, ফেনীতে শান্তিরহাট থেকে মিঞা জান ঘাটের নিকটবর্তী ফেনী নদীর মোহনা পর্যন্ত এলাকায় ১৯৩৮ থেকে ৪০ সালে। বন-মোরগ ও মথুরী আক্লেশে শিকার করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমায় ১৯৪০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত। পরবর্তী তিন বছর কেটেছে জামালপুর এবং নোয়াখালী এলাকায় প্রচুর জলচর পাখি শিকার করে। ১৯৫০ পর্যন্ত পরবর্তী তিন বছর কেটেছে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলায় জলচর-পাখি শিকারে। তবে, স্মৃতিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে মধুপুরের বন-মোরগ এবং ছোট হরিণ শিকার।

১৯৪৪ সনে যশোর সদরে থাকাকালে একবার উপর্যুপরি দুই গুলিতে অনেকগুলি স্নাইপ মেরেছিলাম। জবেহ করার সময় গুণতির মধ্যে ১৩৫টি পাওয়া গিয়েছিল। গভীর জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে যে আরও অনেক হারিয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে পড়ে ১৯৪৬ সালে তিস্তা নদীতে অনেক রাজহাঁস ও চখা শিকার করেছিলাম। এই সময় জলপাইগুড়ির অভ্যন্তরে এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে শিকার করার সুযোগ হয়েছিল। ওখানে আমি প্রচুর হরিণ শিকার করি।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের মধ্য ভাগে জনাব ওমদতুল ইসলাম আমাদের বাড়িতে শিকার উপলক্ষ্যে মেহমান হন। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি তাঁর সংগে বেরুতে পারিনি। তবে আমার দু'জন বাছা অনুচর ও লোকজন সঙ্গে দিয়ে তাঁকে ছয় মাইল দূরবর্তী গজলিয়া বনে পাঠাই। তাঁদের দলের আহমদুর রহমান মুন্সী একটি অজগরকে গুলি করে মারেন। ওটার পেট ফাড়ার সময় দেখা যায় যে পেটে আস্ত একটি বাচ্চা হরিণ রয়েছে। দলের তৈয়ব উল্লাহ সওদাগর একটি বড় হরিণকে গুলি করেন। কিন্তু ওটার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি।

একবার বাঘের সন্ধানে করতোয়া নদীর উৎপত্তি স্থানের কাছাকাছি গিয়েছিলুম। হিমালয়ের পাদদেশের বাঘ আকারে সম্ভবত সবচেয়ে বড়। কিন্তু বাঘ মারার সুযোগ পেয়েও সমস্ত সম্ভাবনা পেছনে ফেলে ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়। সেদিন শিকারে বেরুবার পূর্বে অত্যধিক মাথা ধরেছিল। উপশমের জন্য কিছু সেরিডন খেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওটা ছিল আসলে কুইনাইন। অকুস্থলে পৌছে আমি ভুল বুঝতে পারি। ইতোমধ্যে মাথাধরা কমবে কি আরও চরমে উঠেছিল। অগত্যা ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়।

পঞ্চাশ বছরের শিকারি জীবন। পশুপাখির চাল চরিত্র সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যেতো। কিন্তু সময়াভাব। আল্লাহতালার অশেষ শুকরিয়া। এই দীর্ঘ কালে আমি এমন কোন ঘটনার কারণ হইনি যাতে কারো কোন জখম হয়েছে বা কারুর জীবন বিপন্ন হয়েছে। আমার নীতি ছিল ঃ বরং শিকার ছেড়ে দেওয়া কিন্তু কিসের উপর গুলি করছি সেটা সঠিক রূপে দেখার আগে গুলি না করা।

জীবনে বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু সমস্ত ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নিয়ে সঙ্গীদের নিরাপদ রাখার মধ্যেই আমি সর্বাধিক আনন্দ পেয়েছি। ক্রীড়া সঙ্গীদের অনেকেই দেহত্যাগ করেছেন। আমিও তাঁদের পথের দিকে তাকিয়ে আছি। তামাম শোধ। ফী আমানিল্লাহ।